গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার মুহূর্তগুলো

সাতের দশক যাঁর নেতৃত্বে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল, সেই চারু মজুমদারের জীবনকথা। সেই ঝোড়ো হাওয়ার সময় ও রাজনীতি ফিরে দেখার প্রয়াস। পড়লেন **সৌমিত্র দস্তিদার**

কৃষেন্দু চাকী

'উত্তরে হাওয়া করুক না ধাওয়া
লাল হয়ে যাক বসুন্ধরা'।

কোন ছোটবেলায় পড়া অখ্যাত কোনও কবির লেখা পুরো কবিতাটা এখন আর মনে নেই। তবে এই চারটে লাইন এত বছর বাদেও স্পষ্ট মনে থেকে গেছে।

অদ্ভুত এক ঝোড়ো হাওয়া সত্যিই তখন আমাদের বয়সী কিশোর-তরুণদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেওয়ালে দেওয়ালে অপটু হাতে আলকাতরায় লেখা— তোমার বাড়ি আমার বাড়ি নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি... স্টেনসিল ছাপে স্পষ্ট এক মুখ। পাশে লেখা 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান'। মাও সে তুং তখন আমাদের আইকন। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মুক্তি আন্দোলনের নেতা। তবে ভারতের রাজ্য রাজ্যে তখন বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ আছড়ে পড়েছে। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে দার্জিলিং জেলার তরাইয়ের অখ্যাত তিন গ্রাম নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়ায় জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। জন্ম নিয়েছে নতুন ধারার এক কৃষক আন্দোলনের। যার মুখ্য নেতা শিলিগুড়ি মহানন্দা পাড়ার আপসহীন কমিউনিস্ট চারু মজুমদার।

বহু দিন বাদে অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা, 'সত্তরের স্বপ্ন যোদ্ধা চারু মজুমদার' পড়তে পড়তে কখন কী ভাবে যেন অগ্নিগর্ভ সেই সময়ে চলে গেছিলাম। সহজ গদ্যে, বিপুল যত্নে ও পরিশ্রমে দু'মলাটের মধ্যে শুধু চারু মজুমদারের জীবন-কাহিনি নয়, একটা সময়কে সামনে নিয়ে এসেছেন যা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। সেই সময় মনে পড়লে কত কত স্মৃতি ফ্ল্যাশব্যাকের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। খুব কম পরিবার তখন পশ্চিমবঙ্গে ছিল, যাদের কোনও না কোনও ভাবে আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ ছিল না। কত হাজার হাজার তরুণ নিজেদের স্বার্থ, কেরিয়ারের তোয়াক্কা না করে নকশালবাড়ির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন তা ভাবলে এখন অবাক লাগে। '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছাড়া উপমহাদেশের রাজনীতিতে এত ব্যাপক অভিঘাত নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম ছাড়া আর কোনও গণ-আন্দোলন করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না।

চারু মজুমদার বলতেন, 'যে স্বপ্ন দেখে না এবং অন্যকে দেখাতে পারে না সে বিপ্লবী হতে পারে না। হাজার সমালোচনা সত্ত্বেও কোন সন্দেহ নেই নকশালবাড়ির রাজনীতি অচলায়তন ভেঙে নতুন এক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সুবিধাবাদী, আপসকামী, সংসদ-সর্বস্ব, চরম দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে নকশালবাড়ির রাজনীতি নতুন ভাবে বৈপ্লবিক এক ধারাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, তাতে কোথাও কোনও সন্দেহ নেই। লেখক একটা বড় কাজ করেছেন যে চারু মজুমদারের উত্থান ও নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃত পটভূমিকা সহজ ভঙ্গিতে লিখে এই প্রজন্মের বাম সমর্থকদের কাছে অনেক না-জানা বিষয়কে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আজকের দিনে, চরম দক্ষিণপন্থী রাজনীতির কালে এই বইটি প্রাসঙ্গিক স্রেফ চারু মজুমদারের জীবনের গল্প শোনার কারনে নয়। পড়লে বোঝা যায় নকশালবাড়ির রাজনীতি এখনও শাসকদের ত্রাস বলেই খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও বলতে হয়, 'আর্বান নকশাল' তো বটেই, তাদের মতাদর্শ যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরা সবাই দেশদ্রোহী। যদিও ইদানীং কখনও কখনও মনে হয় গত শতকের ছয়ের দশকে জমি আন্দোলনের প্রশ্নে একেবারে রাষ্ট্র বদলে দেবার ডাক কতটা সময়োপযোগী ছিল, তা নিয়ে। হতে পারে, যা আগেও বলেছি যে ভারতের কমিউনিস্টদের চিরকালীন যে দোদুল্যমান অবস্থান, সুবিধাবাদী ঝোঁক তার বিপরীতে নকশালবাড়ির রাজনীতি চলতে গিয়ে এক ধরনের 'লেফট অ্যাডভেঞ্চারিজম'-এর জন্ম দিয়েছিল।

অতি-বাম রাজনীতি শুধু ভারতে নয়, পূর্ব বঙ্গের রাজনীতিতেও বাম আন্দোলনের নিশ্চিত

> শোনা যায়, একদা হরেকৃষ্ণ কোঙার ঠাট্টা করে কেউ দার্জিলিং যাচ্ছেন শুনলেই বলতেন, 'যাও, হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য আর শিলিগুড়ির বিপ্লব-ক্ষ্যাপা বুড়োটাকে দেখে এসো'।

ক্ষতি করেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাশ হঠকারী রাজনীতির কারণেই বামদের হাত থেকে পুরোপুরি জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে গেছিল। ফলে আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে নিতান্তই গৌণ হতে হতে প্রায় মুছে গেছে বামপন্থী রাজনীতির অবদান। তার পিছনে চারু মজুমদারের অন্ধ অনুসরণ নিঃসন্দেহে দায়ী।

অশোককুমার মুখোপাধ্যায় চারু মজুমদারের ইতিবাচক ভূমিকা বলেছেন। নেতিবাচক কথা বলেননি। এটাও উপমহাদেশের বড় সমস্যা। ব্যক্তিপুজো প্রায় সময়ই যথার্থ ইতিহাসকে আড়াল করে রাখে। মূর্তিপুজোর বিরোধিতা করে একদা মনীষীদের শিরোচ্ছেদের ফতোয়া দেওয়া নকশালপন্থীদের মধ্যেও ব্যক্তিকে দেবতা করে তোলার প্রবণতা কম নয়।

লেখক এক জায়গায় চারুবাবুর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা আশৈশব, এটা বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন যে তিনি স্কুলে, ছোট ক্লাস থেকেই বিড়ি, সিগারেট, মদ খেতেন। আমার মনে পড়ে গেল মাওবাদীদের ডেরায় একবার এই কথাগুলো বলে খুব বিপদে পড়ে গেছিলাম। রেড আর্মির এক কম্যান্ডার চারু মজুমদার মদ খেতেন বলায় আমাকে এই মারে কি সেই মারে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আমার খুব প্রিয় কিছু মানুষের কথা সামনে নিয়ে এসেছেন। তাঁরা সবাই কোনও না কোনও ভাবে চারু মজুমদারের আপনজন। স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় ছিলেন চারু মজুমদারের নিজের দিদির মতো। চারুবাবুর ছেলে-মেয়েদের ভালো মা। আমারও ভালো মা। তিনি অসম্ভব ভালবাসতেন ভাইকে। বিশ্বাস করতেন খুব। এতটাই যে, আমাকে প্রায় বলতেন, 'চারু বলে গেছে, বিপ্লব হবেই। চারু কখনও মিথ্যে বলত না। ফলে আজ না হয় কাল বিপ্লব হবেই।' চারু মজুমদারের ছেলে অভি দীর্ঘদিন ধরেই ঘনিষ্ঠজন। কিন্তু ও বাড়িতে এখনও অনিতাদি সবচেয়ে আপনার জন।

বাইশটি ছোট ছোট অধ্যায়ে দু'শো ছত্রিশ পাতার ব ইটি ছেপেছে আনন্দ পাবলিশার্স। অশোকবাবু কোথায় কোথায়, কোন কোন শেল্টারে চারু মজুমদার পুলিশের নজর এড়িয়ে আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে থাকতেন, তার দীর্ঘ তালিকা দিয়ে চমৎকার কাজ করেছেন। শুধু বিনয়ের সঙ্গে একটা তথ্য না দিয়ে পারলাম না। এন্টালি ক্রিস্টোফার রোডের সিআইটি বিল্ডিংয়ের এ ব্লকের তিনতলায়, আমার মামার বাড়িতে এক দিন এক শীর্ণ চেহারার প্রৌঢ়কে প্রণাম করতে গেলে তিনি পা সরিয়ে বলে উঠলেন, অচেনা লোককে না জেনে প্রণাম করতে নেই। শুনলাম তিনি মামিমার দূর সম্পর্কের দাদা। খুলনা থেকে চিকিৎসা করতে কলকাতায় এসেছেন। আরও পরে তিনি ধরা পড়ার পরে কাগজে ছবি দেখে জেনেছিলাম, তিনিই চারু মজুমদার। এ খবরটি আশা করি অশোকবাবুর দ্বিতীয় সংস্করণে কাজে লাগবে।

এ বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে লেখকের দরদ। তরাই ডুয়ার্সের ছোট ছোট নদীর মতোই তরতরিয়ে লেখা এগিয়েছে। আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়ে চলেছি, আপাত-সাধারণ একজনের অসাধারণ হয়ে ওঠার কাহিনি। দরদ দিয়ে সহজ ভাষায় এক বিপ্লবীর জীবনী লেখা সহজ নয়। পড়তে পড়তে কখনও কখনও যেন অজান্তেই চলে যাচ্ছি মহানন্দা নদীর পাড়ে। স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় গল্প করতেন, মন খারাপ হলে চারু একা একা নদীর কাছে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকত। কত কত গল্প আমি ভালো মার কাছে শুনতাম। তিনি বলতেন, 'চারু চুনোমাছের ঝোল ভালবাসত। বাড়িতে পরিপাটি করে খাওয়া তো কচিৎ কদাচিৎ জুটত। এমন হয়েছে, চারু খেতে বসেছে। গুছিয়ে মাছ ভাত খাচ্ছে। হঠাৎ খবর এল, অমুক জোতে বা চা বাগানে গুলি চলেছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। চারু খাবার ফেলে ছুটত। কত বলতাম, খেয়ে যা। কোনও কথাই শুনত না। তখন তার অন্য চেহারা। চোয়াল শক্ত। মনে হত যেন এক কালবৈশাখী ঝড়'। সিপিআই(এম) নকশালবাড়িতে গুলি চলা ও পরিণতিতে কৃষক খুনের সমালোচনা প্রথম দিকে করেছিল। আসলে জমির আন্দোলনে কৃষকের পাশে থাকাই ছিল পার্টির নীতি। গণ-আন্দোলনে পুলিশ যাবে না, এটাও ছিল সিপিআই(এম) দলের ঘোষিত সিদ্ধান্ত। পুরনো 'গণশক্তি' পড়লেই জানা যায় যে, প্রাথমিক ভাবে দল নিজেদের কৃষক সংগঠনের পাশেই ছিল। পরে দেখল, এ তো সশস্ত্র সংগ্রামের পথে চলে যাচ্ছে, তখন তারা সংসদীয় অবস্থান থেকে বের হতে চাইল না। চারু মজুমদার কোনও কালেই পার্টি নেতৃত্বের ধামাধরা ছিলেন না। স্রেফ ভোটের মাধ্যমে সমাজ-কাঠামো বদলে দেওয়া যায় না, এটা বুঝতে চারু মজুমদারের দেরি হয়নি। সিপিআই(এম) দলের বড় অংশ নকশালবাড়ির রাজনীতিতে ঝুঁকছে, তার প্রধান কারণ যে চারু মজুমদার সেটাও সিপিআই(এম) বুঝেছিল। ফলে আজও কখনও সখনও চারু মজুমদারের প্রতি ব্যক্তি আক্রমণ সংসদীয় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আকছার হয়।

শোনা যায়, একদা হরেকৃষ্ণ কোঙার ঠাট্টা করে কেউ দার্জিলিং যাচ্ছেন শুনলে বলতেন, 'যাও, হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য আর শিলিগুড়ির বিপ্লব-ক্ষ্যাপা বুড়োটাকে দেখে এসো'। চারু মজুমদারের সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, এটা ঠিকই। কিন্তু স্রেফ ভোটের মাধ্যমে, রাষ্ট্রের কাছে আভূমি নত হয়ে, গণ আন্দোলন বিসর্জন দিয়ে , আর যা-ই হোক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হবে না। এটা বহু দিন আগেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল নকশালবাড়ির রাজনীতি। যার অন্যতম প্রধান সেনাপতির নাম— চারু মজুমদার।

সত্তরের স্বপ্নযোদ্ধা চারু মজুমদার
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
আনন্দ পাবলিশার্স। ৫০০ টাকা